279

NOV. 22 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

দৈনিক ইত্তেফাক

নকলের ক্ষত বেড়েছে ডিগ্রি পরীক্ষায়

মোস্তফা হোসেইন

শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি আমাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে দিচ্ছে। এ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন শিক্ষকদের একটি অংশ, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অনেকে। শিক্ষাক্ষেত্রের এই হতাশাজনক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সব মহল। মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত হতাশাজনক বক্তব্য দিতে শোনা যায় এ সম্পর্কে। গত তের নভেম্বর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি অকপটে বলেছেন এ দুর্বিষহ চিত্রের কথা। এমন একটা হতাশাজনক পরিস্থিতিতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডিগ্রি পরীক্ষা।

পরীক্ষা নিয়ে ইতোমধ্যে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছে। সন্দেহ আর অবিশ্বাস কেটে ওঠেনি মোটেও। এবারও কি পুনরাবৃত্তি ঘটবে সব কিছুর? অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের বৃহৎ তালিকা আর পরীক্ষায় ব্যাপক টোকাটুকি এসবই কি আবার ডিগ্রি পরীক্ষার খবরের প্রধান অংশ হয়ে থাকবে? এ প্রশ্নগুলোর জবাব ইতিবাচক নয়। তেমন লক্ষণ পরিষ্কার। নকলের ব্যাপারটা তো পরীক্ষার শুরুতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। প্রথম দিনেই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সচিত্র সংবাদে দেখা গেছে, কিভাবে নকল চলছে পরীক্ষা কেন্দ্রে। ছয় হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে সেদিন। তাতেও এ কথা বলা যায় না যে, বাকী পরীক্ষাগুলো হবে নকলবিহীন। গত বছরও পরীক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে ব্যাপক। তারপরও অধিকাংশ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এমন কলেজও দেখা গেছে, যেখানে ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের কেউই উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এমন কলেজের সংখ্যা ১৮টি বলে একটি খবর থেকে জানা যায়। যার মধ্যে সরকারী কলেজও রয়েছে। এসব কলেজ থেকে এবারও শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। 'ফেইলিউর ইজ দ্যা পিলার অব সাকসেস' এই প্রবাদের মতোই যেন ঘটনাটা। গত বছরের ব্যর্থতাকে সঙ্গে নিয়ে সে কলেজগুলো থেকে এবারও পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। গতানুগতিক ধারার অংশই এটা। গতানুগতিকভাবেই ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো রকম কার্যকর জবাবদিহিতারও প্রয়োজন হয়নি। দুঃখজনক হচ্ছে এ নিয়ে আজ পর্যন্ত এমন কোনো খবর আমাদের চোখে পড়েনি যাতে সংশ্লিষ্ট কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যর্থতার জন্য উদাহরণযোগ্য শাস্তি পেতে হয়েছে।

জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক অবস্থাই আমাদের চোখে পড়ে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে বিষয়টি নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন তেমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তা প্রমাণের জন্য নকলপ্রবণ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে আবারো পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়ার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে এবং যেগুলোর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই সেসব পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হওয়ার কথা। আশ্চর্যজনক হচ্ছে, সেগুলো বাতিল করার নির্দেশ দেয়ার পর আবার তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন মাধ্যমে জানানো হয়েছে- আগে যেসব পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিলো সে সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। বলা হয়েছে নকলের জন্য ঐসব কেন্দ্র বাতিল করা হয়নি। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, যেসব প্রতিষ্ঠান নকলের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাস্তব হচ্ছে, কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি।

আবার বলা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ চেয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক চাপের কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ যুক্তিকে তারা রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলেও তাকে সর্বাংশে মেনে নেয়া যায় না। আবার স্থানীয় প্রেসার গ্রুপের দাপটে তাদের ত্রাহি অবস্থা নয় এমনও বলা যাবে না। কিন্তু স্থানীয় প্রেসার গ্রুপকে ডিঙ্গিয়ে প্রশাসন কাজ করতে পারবে না এমন কথাকেও বিনাবাক্যে মেনে নেয়া যায় না। ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয়। এমন উদাহরণ প্রচুর আছে। কুমিল্লা জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় অবস্থিত একটি কলেজের নেয়া পদক্ষেপ এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ কলেজের ফলাফল সারা দেশকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। রেসিডেন্সিয়েল কলেজ, ক্যাডেট কলেজগুলো পর্যন্ত গ্রামের ঐ কলেজের কাছে হার মেনেছে। পাসের হার এবং ফলাফল ধরে রাখার জন্য তারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাও চোখে পড়ার মতো।

স্থানভেদে নকল প্রবণতা কম-বেশি হয়ে থাকে। এর মাত্রা মফস্বলে ব্যাপক। সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শহুরে শিক্ষকদের চেয়ে অধিক সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। তাদের সামাজিক কাজের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত হতে হয়। সমাজও তাদের কথা তুলনামূলকভাবে বেশি শুনে থাকে। ফলে তাদের ভূমিকা যদি অনাচারের বিরুদ্ধে হয় তাহলে সেখানে সহজেই নকল প্রতিরোধ হতে পারে। কার্যত সেখানে তা অনুপস্থিত। অথচ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা দেখা যায় নকল করার পক্ষে।

সেই কলেজের একজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেছিলাম হরতাল-ধর্মঘটের সময় ঐ কলেজের ভূমিকা কি থাকে। তার জবাব ছিল, ঐ কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ। পাশাপাশি হরতাল-ধর্মঘটের কারণে যাতে কোনোভাবেই শিক্ষা পরিবেশ বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সজাগ। ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। গত কিছুদিন আগে তারা কলেজের বাইরে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। সে ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সজাগ। ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। গত কিছুদিন আগে তারা কলেজের বাইরে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলো।

হরতাল ধর্মঘট হলে তা স্থানীয় প্রেসারগ্রুপের হাত ছাড়া হয় না। আর জাতীয়ভাবে যদি কোনো কর্মসূচী পালন করা হয়ে থাকে তা যে অত্যন্ত শক্তিশালী তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপরও কুমিল্লার মুরাদনগর থানার আবদুল মজিদ কলেজ শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছে। নিজেরা হরতাল কিংবা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কথা বলেনি। তারা এ নিয়ে মিছিল মিটিংও করেনি। বরং নিজেদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করার কারণে জনগণের পূর্ণ সমর্থন তারা পেয়েছে। অভিভাবকরাও সন্তুষ্ট রয়েছে তাদের এই পদক্ষেপের কারণে।

প্রশ্ন আসে তাহলে ঐ এলাকায় কি রাজনৈতিক দল নেই? ঐখানে কি রাজনৈতিক প্রেসারগ্রুপের অস্তিত্ব নেই? অবশ্যই অস্তিত্ব আছে এবং তারা বাংলাদেশের অন্য দশটি জায়গার মতো নিজেদের কাজও করে যাচ্ছে। পার্থক্য হচ্ছে এখানে প্রেসারগ্রুপ প্রতিষ্ঠানের সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকার কারণে কিছু করতে পারে না।

নকলের বিষয়টি যদি আলোচনায় আসে সেখানেও দেখবো কখনো বলা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে অভিভাবক, পরীক্ষার্থী এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা এ অপকর্ম সম্পাদনে সহযোগিতা করে আসছে।

স্থানভেদে নকল প্রবণতা কম-বেশি হয়ে থাকে। এর মাত্রা মফস্বলে ব্যাপক। সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শহুরে শিক্ষকদের চেয়ে অধিক সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। তাদের সামাজিক কাজের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত হতে হয়। সমাজও তাদের কথা তুলনামূলকভাবে বেশি শুনে থাকে। ফলে তাদের ভূমিকা যদি অনাচারের বিরুদ্ধে হয় তাহলে সেখানে সহজেই নকল প্রতিরোধ হতে পারে। কার্যত সেখানে তা অনুপস্থিত। অথচ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা দেখা যায় নকল করার পক্ষে। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা অধিক হারে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে একান্তই অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। এমনও দেখা গেছে যে, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ফিস-এর দ্বিগুণ আদায় করেও পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে তারা। এখানে পরীক্ষার্থীর নিজের মেধা কিংবা যোগ্যতা বিচার্য নয় টাকাই হয়ে ওঠে মূল বিষয়। আর এ কাজটি করার সময় সবসময়ই একটা উদ্দেশ্য কাজ করে, তা হচ্ছে পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকলের সুযোগ করে দেয়া।

স্থানীয় প্রেসারগ্রুপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সুযোগটিকে কাজে লাগায়। যদি প্রতিষ্ঠান নীতিতে অটল থাকে তাহলে স্থানীয় প্রেসারগ্রুপ ধারেকাছে ঘেঁষার সুযোগ পাবে কম এটা স্বীকার করতে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই আরেকটি কথা বলা যায়- তা হচ্ছে এই প্রেসারগ্রুপের শক্তি-সামর্থ্য এবং দাপট গ্রামের তুলনায় শহরে বেশি। সঙ্গত কারণেই বলা যায়, যদি প্রেসারগ্রুপের কারণেই নকল হয়ে থাকে তাহলে শহরে নকল বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি সেখানে তা হচ্ছে না। শহরে সন্ত্রাসীদের দাপটে মানুষ যেখানে তটস্থ সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থাকে তুলনামূলকভাবে শান্ত। নকল করার সুযোগ এখানে খুবই কম। পাশাপাশি দেখা যায় নকলপ্রধান কেন্দ্রগুলোর চেয়ে শহরের কেন্দ্রগুলো থেকেই বেশি হারে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে।

সুতরাং এককভাবে স্থানীয় প্রেসারগ্রুপের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পার পাওয়ার সুযোগ কম একথা বলতে দ্বিধা নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন, স্বাভাবিকভাবে রাজনীতির থাবা সম্প্রসারিত হয়েছে এটা আমাদের স্বীকার করতে অসুবিধা নেই। পরীক্ষায় নকলবাজির হোতাদের একটি হচ্ছে স্থানীয় নেতাকর্মীদের কেউ কেউ তাও আমরা স্বীকার করি। আর এ বিষয়টিকে সামাল দেয়ার দায়িত্ব শুধু কলেজ কিংবা স্কুল কর্তৃপক্ষেরই নয়। এককভাবে তারা তা মোকাবেলা করতে পারবে একথা বলার সুযোগও কম। এর জন্য সামাজিক সচেতনতা তৈরি হওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের সততা অপরিহার্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডই হয়ে পড়েছে বিতর্কিত। কিছু কর্মচারী এবং কর্মকর্তা অসদুপায় অবলম্বন করে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে বিতর্কিত করে দিয়েছে। এখানকার কাজে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পর্যন্ত অসন্তুষ্ট। তারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণে অধিক মনোযোগী না হয়ে অন্যবিধ কাজে মনোযোগী হওয়ার কারণে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। এমনকি নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিলো সেগুলো তেমন কার্যকর হয়নি। যে-সব অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের আবারো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেগুলোর জন্য প্রভাবশালী মহল থেকে তদবির ও সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা যায়। ঐসব প্রতিষ্ঠানকে নকলমুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েই কেন্দ্রগুলো রক্ষা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হয়েছিলো যে যারা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো বহাল রাখার জন্য তদবির করেছিলেন তারা নিশ্চয়ই নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন। দুঃজনক হচ্ছে তারা তেমন ভূমিকা নিয়েছেন এমন কথা খবর মাধ্যমে আজও জানা যায়নি।

পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে দুয়েকটি প্রচারণা আমাদের চোখে পড়েছে। তারা নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে পত্রিকা মাধ্যমে জানা গেছে। এমন একটি প্রচারণা আমরা দেখতে পেয়েছি ঢাকা শহরের একটি এলাকা সম্পর্কে। যেখানে নকলের প্রবণতা নেই বললেই চলে সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ হতে পারলে নকলপ্রবণ এলাকাগুলোতে কেন হচ্ছে না তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন এসে যায়। অবশ্য তার উল্টো অনুমানের খবরও আমরা ইতোমধ্যে দেখতে পেয়েছি। জানা গেছে, স্থানীয় প্রভাবশালী মহল নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই নাকি পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী ভূমিকা নিচ্ছে না। এই মহল নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই প্রশাসনকেও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

অথচ নকল প্রতিরোধের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা দরকার। সমন্বয়ের প্রয়োজনের কথাও একই কারণে চলে আসছে। অথচ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনের সঙ্গে টানাপোড়েন চলছে এমন সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন যেসব পরীক্ষাকেন্দ্র ইতিপূর্বে বাতিল করা হয়েছিলো সেগুলোর ব্যাপারে সুপারিশকারী হিসেবে ছিলেন জেলা প্রশাসকগণ। জানা গেছে, জেলা প্রশাসকদের সুপারিশের ভিত্তিতে যেসব কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের কোন সুপারিশ নেয়া হয়নি। এই সমন্বয়হীন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সেখানে প্রশাসন কি তেমন উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে?

তবে একটা কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, নকল প্রতিরোধের জন্য পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করা খুব কার্যকর বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। পুলিশের কাজ কেন্দ্রের বাইরেই সীমাবদ্ধ। ভিতরে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি পুলিশের সীমানার বাইরে। সেখানে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে সবচেয়ে আগে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তারা যদি ঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা হলে স্বাভাবিকভাবেই নকল প্রবণতা কমে আসবে। পুলিশ কাজ করে পরীক্ষাকেন্দ্র এলাকায় যাতে কোনো রকম আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ না হতে পারে সে লক্ষ্যে। তারা পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নকল প্রতিরোধ করার কাজে কোনো রকম ভূমিকা পালন করতে পারে না। যে কারণে কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা গেছে অত্যন্ত শান্ত পরিবেশ বজায় থাকলেও সে শান্ত পরিবেশ মূলত শান্তিপূর্ণভাবে নকল করার পরিবেশকেই ইঙ্গিত করেছে। সুতারং নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে পুলিশ-বিডিআর নিয়োগের কথা যত বড় করেই বলা হোক না কেন নকল প্রতিরোধের জন্য এটা বিশেষ কোনো পদক্ষেপ বলে মনে করার কারণ নেই। ❑